কালীগঞ্জে ইয়াবায় ছয়লাব, বিপন্ন যুবসমাজ, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন!

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলায় দিন দিন ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে মাদকের বিস্তার। এক সময়ের শান্ত-নিরাপদ জনপদ এখন ইয়াবা ও বিভিন্ন মাদকদ্রব্যের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত গড়ে উঠেছে মাদকসেবী ও ব্যবসায়ীদের শক্তিশালী নেটওয়ার্ক। নতুন করে বাজারে প্রবেশ করা ট্যাপেন্টাডল (ঞধঢ়বহঃধফড়ষ) নেশাজাতীয় ট্যাবলেট পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

স্থানীয়দের দাবি, মাদকের সহজলভ্যতা কিশোর ও তরুণদের দ্রুত নেশার জগতে ঠেলে দিচ্ছে। নেশার অর্থ জোগাতে অনেকেই চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও রাহাজানির মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে পুরো এলাকায় চরম নিরাপত্তাহীনতা ও সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কালীগঞ্জ পৌর এলাকার পাশাপাশি কাশিপুর, চাচড়া, শিবনগর, আড়পাড়া, নদী-আড়পাড়া, ঢাকালে পাড়া, বলিদাপাড়া, সিংঙ্গী, রায়গ্রাম, দুলালমুন্দিয়া, ফয়লা, হেলাই, মাস্টারপাড়া, পাইকপাড়া, চাপালী, শ্রীরামপুর, আনন্দবাগ, খয়েরতলা, বাকুলিয়া, ভাটপাড়া, মহাদেবপুর ও আলাইপুরসহ আশপাশের বহু এলাকায় সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত প্রকাশ্যে মাদক বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া বারোবাজারের মঙ্গলপৈতা, সোনালী ডাঙ্গার মোড়, বারফা ব্রিজ এলাকা, মাজদিয়া বাউড়ের বড় ব্রিজ, বাদুরগাছা মাজার সংলগ্ন এলাকা, মিঠাপুকুর মোল্লাপাড়া, মহিষাহাটি-বাদুরগাছা সড়ক, রাখালগাছি, জাহাজমারির ঘাট, ধোপাদি বাজার, কাষ্ঠভাঙ্গা, সাঁক বাজার ও সাদিকপুরসহ বিভিন্ন স্থানে মাদক ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলেছে বলে অভিযোগ এলাকাবাসীর। স্থানীয়দের ভাষ্য, এসব স্থানের অনেকগুলোই অতীতেও মাদক ব্যবসার জন্য পরিচিত ছিল। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী ব্যক্তি ও কিছু জনপ্রতিনিধির ছত্রচ্ছায়ায় এই অবৈধ ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, মাদক ব্যবসায়ীরা শুধু বিক্রিই করছে না, বরং বাইরের জেলা থেকে আসা মাদকসেবীদের জন্যও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত

করছে। অনেক তরুণ পাশের জেলা থেকে এসে এখানে মাদক সেবন করে নির্বিঘ্নে ফিরে যাচ্ছে। ফলে কালীগঞ্জ ধীরে ধীরে আঞ্চলিক মাদককেন্দ্রে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন সচেতন মহল।

র্যাব, জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি), থানা পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করলেও মাদকচক্রের দৌরাত্ম্য কমছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। মাঝেমধ্যে মাদকসহ ব্যবসায়ীরা গ্রেপ্তার হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই জামিনে মুক্ত হয়ে পুনরায় একই ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে বলে দাবি তাদের। স্থানীয়দের প্রশ্ন, যদি অভিযানের পরও মাদক ব্যবসা আগের মতো চলতে থাকে, তাহলে এর স্থায়ী সমাধান কোথায়?

স্থানীয় সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী আনোয়রুল ইসলাম রবি বলেন, আগের দিনের শান্ত গ্রামগুলো আজ নেশার অভয়ারণ্যে পরিণত হচ্ছে। যে তরুণদের চোখে ছিল স্বপ্ন, আজ তাদের অনেকের চোখে শুধু নেশার ঘোর। মাদক মানুষের ভেতরের শক্তি, বিবেক ও ভবিষ্যৎ, সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তিনি আরও বলেন, মাদক এখন শুধু দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং সচ্ছল ও শিক্ষিত পরিবারের সন্তানরাও দ্রুত এর শিকার হচ্ছে।

স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতে, মাদকের কারণে পরিবারে অশান্তি, সামাজিক অবক্ষয়, মানসিক বিপর্যয় এবং অপরাধপ্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক অভিভাবক জানান, বর্তমানে ১২-১৩ বছর বয়সী কিশোরদের মধ্যেও মাদকাসক্তির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের ভাষায়, একসময় ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা আর পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকত। এখন অনেকেই ইয়াবা ও ফেনসিডিলের দিকে ঝুঁকছে। সন্ধ্যার পর সন্তানকে বাইরে পাঠাতে ভয় লাগে।

তাদের অভিযোগ, মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কথা বললে নানা ধরনের ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়। ফলে অনেকেই প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে সাহস পান না। গ্রামাঞ্চলে মাদকের বাজার আরও বিস্তৃত হচ্ছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। স্থানীয়দের মতে,গ্রামে মাদকের চাহিদা বেশি, ভয় কম। ফলে বিক্রেতারা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জেল্লাল হোসেন বলেন, উপজেলাকে মাদকমুক্ত করতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে এবং

মাদক ব্যবসায়ী কিংবা সেবনকারী, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। পুলিশের দাবি, মাদকচক্র নির্মূলে স্থানীয় জনগণের তথ্য ও সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত অভিযানের মাধ্যমে মাদক নিয়ন্ত্রণে কাজ চলছে।

তবে এলাকাবাসীর দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে মাদকের বিরুদ্ধে পুলিশের দৃশ্যমান তৎপরতা আগের তুলনায় কমেছে। এছাড়া থানা পুলিশের কয়েকজন এএসআই ও এইআই এর বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তারা। যদিও এসব অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মাদক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ না নেওয়া হলে জনরোষ সৃষ্টি হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। তাদের মতে, এখনই কঠোর ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা না নিলে পুরো একটি প্রজন্ম ধ্বংসের মুখে পড়বে।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক শেখ মোহাম্মদ হাসেম আলী জানান, সত্য বলতে মাদক কারবারির সংখ্যা বেড়েছে সাথে সাথে মামলার সংখ্যা বেড়েছে। নিয়মিত অভিযান চলছে। মাদকের সাথে কোন আপোষ নয়।

এলাকাবাসীর দাবি, মাদক নিয়ন্ত্রণে এলাকাভিত্তিক স্থায়ী চেকপোস্ট ও পুলিশ টহল জোরদার করতে হবে, স্কুল-কলেজে নিয়মিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করতে হবে, মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। একই সঙ্গে মাদক ব্যবসায়ী ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণেরও দাবি জানিয়েছেন তারা।

এক সময় সংস্কৃতি, সম্প্রীতি ও সামাজিক শান্তির জন্য পরিচিত কালীগঞ্জ আজ মাদকের ভয়াল থাবায় ক্ষতবিক্ষত বলে মনে করছেন সচেতন মহল। তাদের মতে, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ, পরিবারের স্থিতি এবং সমাজের নিরাপত্তা, সবকিছুই এখন হুমকির মুখে। মাদকের বিরুদ্ধে এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক কঠোরতা এবং সামাজিক প্রতিরোধের সমন্বিত উদ্যোগ। অন্যথায় আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে।

অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম

চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার সাংবাদিকদের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) কর্তৃক ‘নির্বাচনকালীন সাংবাদিকতা’ বিষয়ক দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশিক্ষণের উদ্বোধন হয় গত বুধবার সকালে চুয়াডাঙ্গা সার্কিট হাউস অডিটরিয়ামে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেটর সাহানোয়ার সাইদ শাহীন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি নাজমুল হক স্বপন।

বিশেষ অতিথি ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, বাংলাদেশ সাংবাদিক সমিতির চুয়াডাঙ্গা জেলা ইউনিটের সভাপতি অ্যাডভোকেট রফিকুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হুসাইন মালিক, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাধারণ সম্পাদক মাজেদুল হক মানিক, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আযম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

প্রশিক্ষণে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন গণমাধ্যমে কর্মরত প্রায় ৫০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী দিনে ইউল্যাবের শিক্ষক ও সাংবাদিক নাজিয়া আফরিন মনামী নির্বাচনী সাংবাদিকতার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। আলোচনার মধ্যে ছিল নির্বাচনকালীন আচরণবিধি, সংবাদ সংগ্রহে নিরাপত্তা, ভুয়া তথ্য ও গুজব প্রতিরোধ, রাজনৈতিক দলের সমান গুরুত্ব প্রদান এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে দায়বদ্ধ প্রতিবেদন প্রণয়নের বিষয়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সমাপনী অধিবেশনে প্রশিক্ষক ছিলেন, ঢাকা মেইলের নির্বাহী সম্পাদক হারুন জামিল।

প্রশিক্ষণ প্রদানকালে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির কারণে গুজব দ্রুত ছড়ায়। জনগণ সত্য জানতে গণমাধ্যমের দিকে তাকায়।

এই আস্থার মর্যাদা রক্ষার জন্য সাংবাদিকদের প্রতিটি সংবাদ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করা জরুরি। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে ভুল সংবাদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা চর্চা করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, আমরা একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে চাই। ভোটাররা উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিবেন এবং অনিয়ম বা জাল ভোটের ক্ষেত্রে প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করবে।

জেলা প্রশাসক আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন আরও বলেন, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সাংবাদিকদের ভূমিকা অপরিসীম। তারা দায়িত্বশীল ও নিরপেক্ষ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

দুই দিনের প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের হাতে পিআইবি’র পক্ষ থেকে সনদপত্র প্রদান করা হয়।

ডিজিটাল রূপান্তরে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকাডিজিটাল, রূপান্তর, গ্রামীণ, নারী, ভূমিকা

কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলার চর এলাকা কোদালকাটি ইউনিয়নের নতুন পাড়া গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে নূর জাহান শিমুল এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই ঢাকার একটি অনলাইন আইটি প্রতিষ্ঠান থেকে ছয় মাসের গ্রাফিক ডিজাইনের উপর একটি কোর্স করে। শিমুলদের এলাকার অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। আইটি প্রতিষ্ঠানে কোর্স করার সময় সহপাঠী

হিসেবে পরিচয় হয় সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি উপজেলার কাদাকাটি গ্রামের ইতু মন্ডলের সাথে। ইতু ও শিমুলের মতো এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েই কোর্সটিতে ভর্তি হয়েছে। সুন্দরবনের কোল ঘেঁষা কাদাকাটি গ্রামের অধিকাংশ মানুষই দরিদ্র। সুপেয় পানির অভাব, কাজের অভাব এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে এখানকার মানুষের অভাব শেষ হতে চায় না। দেশের দুই প্রান্তের পশ্চাৎপদ দরিদ্র পীড়িত এলাকার দুই মেয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও নিজেকে গ্রাফিক ডিজাইনার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ঘরে বসেই রিমোট হায়ারিং করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বায়ারদের চাহিদামতো কাজ করে ভালোই আয় করছে। পরিবারের দারিদ্র্য দূর করার পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য ছেলে মেয়েদের আইটি প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করে তাদেরও আয়ের ব্যবস্থা করে দিচ্ছে।

সারা পৃথিবীতে প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, তাঁদের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে নারীর অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে। বাংলাদেশে ৮৬ হাজারেরও অধিক গ্রাম রয়েছে। এখনো দেশের বেশিরভাগ জনগণই গ্রামে বসবাস করে। জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি নারী। আবার এ অর্ধেক নারীর সিংহভাগই বসবাস করে গ্রামে। আমাদের গ্রাম বলতে চোখের সামনে চিরাচরিতভাবে ফুটে ওঠা সেটা অজপাড়াগাঁ এখন আর খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। শহরের ছোঁয়া লেগেছে গ্রামগুলোতে। বিদুৎ সুবিধা এখন সব গ্রামেই আছে। একসময় যোগাযোগব্যবস্থা বলতে ছিলো গরুর গাড়ি আর নৌকা। এখন সেই গরুর গাড়ি আর নৌকা দেখতে হলে যেতে হবে জাদুঘরে।

বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের গ্রামীণ অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছে। যার সিংহভাগ অবদান নারীর। গ্রামীণ নারীরা এখনো উচ্চশিক্ষা বা সুশিক্ষা থেকে কিছুটা হলেও পিছিয়ে আছে। তারপরও নিজেদের অদম্য ইচ্ছা, সরকারি-বেসরকারি যে সব সুযোগ সুবিধা রয়েছে সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে নারীরা এগিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। গ্রামীণ নারীরা কুটির শিল্প, বিভিন্ন ধরনের হাতের কাজ, সেলাইসহ নানা ধরনের কাজে যুক্ত থাকলেও এখন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। গ্রামীণ নারীরা এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের দিকে বেশি মনোযোগী। সংসারের

যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করার পর ঘরে বসে রিমোট হায়ারিং করছে। ডিজিটাল রূপান্তরে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা বহুমুখী। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের ডিজিটাল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলছে এবং অর্থনৈতিকভাবে ক্ষমতায়িত হচ্ছে। শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। মোবাইল ব্যাংকিং, অনলাইন বাজার এবং কৃষি-সম্পর্কিত তথ্যের মাধ্যমে গ্রামীণ নারীদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিতেও তারা পিছিয়ে নেই। তারা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থাকার পাশাপাশি ডিজিটাল রূপান্তরের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গ্রামীণ নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান এবং ব্যবহারের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে সমতা আনার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি নারীর ব্যবহার উপযোগী প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ব্যাবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়নসহ সব ক্ষেত্রেই তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং সব ক্ষেত্রে নারীর সমান প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণে অনুকূল পরিবেশ তৈরির জন্য কার্যকর এবং টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তিসহ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম-অংশগ্রহণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীর প্রতিবন্ধকতা এবং সীমাবদ্ধতাগুলো প্রতিনিয়ত চিহ্নিত করে সে গুলো দ্রুত সমাধানের পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০৩০ সাল নাগাদ নারী- পুরুষের সমান অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার জন্য গ্রাম ও শহরকে সমান গুরুত্ব দিয়ে ডিজিটালকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

১৯৭৪ সালে শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ২ দশমিক ৬ শতাংশ। ১৯৯০ সালে ১৪ শতাংশ। ২০১০ সালে নারীর অংশগ্রহণ ৩৬ শতাংশ। ২০২২ সালে নারীর অংশগ্রহণ ছিলো কম-বেশি ৪৩ শতাংশ। বাংলাদেশের জিডিপিতে নারীর অবদান কম-বেশি ২০ শতাংশ।নারী শিক্ষার হার বেড়েছে এবং এতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় নারীরা তাদের দক্ষতা প্রমাণ করছে এবং কর্মক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে। সামাজিক স্বীকৃতিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া নারীপ্রধান পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারীদের আরও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষণ। এর ফলে নারীরা এখন পরিবারের সীমানা পার হয়ে সমাজ এবং দেশের উন্নয়নে বড়ো ভূমিকা পালন করার সুযোগ

পাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ নারী শ্রমিকের কমবেশি ৭৭ শতাংশ গ্রামে বাস করে। নারীরা শুধু কৃষি শ্রমিক হিসেবে নয়, বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি গ্রহণ ও কৃষি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। যদিও তাদের কাজ এখনও যথাযথভাবে স্বীকৃত হয়নি, তবুও তাদের অবদান দেশের কৃষি-খাতকে শক্তিশালী ও উন্নত করছে।

দেশের কৃষি এবং কৃষি সম্বন্ধীয় ব্যাবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প আধুনিকতার ছাপ পড়েছে। হস্তশিল্প, বয়নশিল্প, খাদি ও গ্রামোদ্যোগের প্রভাব আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া মৎস্য চাষ, ফুল চাষ, পাট চাষ, পান চাষ, পশুপালন, দুগ্ধ প্রকল্প, ইক্ষু চাষ এবং তৎসঙ্গে চা- শিল্প ও কাগজ শিল্পও আশার আলো দেখাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের আরও সক্রিয় অংশগ্রহণ নিঃসন্দেহে স্বনির্ভরতা দিয়ে আমাদের উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে। শিক্ষা পদ্ধতিকে সে ধরনের কর্মমুখী করার উদ্দেশ্য সরকার ইতোমধ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। পাহাড়ি জুম চাষ আমাদের অর্থনীতিতে যথেষ্ট সমাদৃত। এসব ক্ষেত্রে তাদেরও উন্নত চিন্তাধারা এবং সহযোগিতার প্রয়োজন। বনজ সম্পদের অবাধ ধ্বংস রোধ করে জুম চাষির চাষ ক্ষেত্রকে উন্নত প্রকল্পের আওতায় আনতে সরকারি সহযোগিতা রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান চিরন্তন। আমরা বাংলাদেশি নারীকে ঘরের লক্ষ্মী বলে জানি। বাস্তবে নারী দূরদর্শী ও অধ্যবসায়ী। আদর্শ সমাজ গঠনের অগ্রদূত। গ্রামীণ অর্থনীতিতে ডিজিটালাইজেশনের ছোঁয়া লেগেছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। কৃষিক্ষেত্রে এখন অনেক শিক্ষিত মহিলা ও তরুণীর প্রত্যক্ষ অবদান চোখে পড়ার মতো। তারাই মাঠে বর্ষাকালীন শস্য থেকে রবিশস্য উৎপাদনের সময় পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করছে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সিংহভাগই মহিলাকেন্দ্রিক ও মহিলানির্ভর। অনেক ক্ষেত্রেই গ্রাম-শহর নির্বিশেষে মহিলাদের শ্রমবিমুখতাও দেখা গেলেও কৃষি, কৃষিভিত্তিক শিল্পে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত নারীরা চাকরির পিছনে না ছুটে নিজেরাই এখন উদ্যোক্তা হচ্ছে। আর এ ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি তাদের সবচেয়ে বেশি সাহায্য করছে।

একসময় নারীদের শিক্ষার সুযোগ সীমিত ছিল। তবে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম সেই বাধাকে দূর করে দিয়েছে। বিভিন্ন ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নারীরা ঘরে বসেই নতুন দক্ষতা শিখতে পারছেন। অনেক নারী অনলাইন কোর্স করে সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ডিজিটাল মার্কেটিং এবং গ্রাফিক ডিজাইন শিখছেন। উদ্যোক্তা হাওয়ার প্রতি নারীদের

আগ্রহ বাড়ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম শুধু ব্যাবসা বা চাকরির জন্য নয়, এটি নারীদের সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রেও সহায়ক হয়েছে। ডিজিটাল রূপান্তরে গ্রামীণ নারীদের ভূমিকা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এর সুফল পাচ্ছে দেশের জনগণ। নারী সচেতনতা যেমন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনি নারীর কর্মসংস্থানসহ অর্থনৈতিতকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে। গ্রামীণ নারীরা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নতুন ব্যাবসা শুরু করছে এবং সফলও হচ্ছে। আমাদের গ্রামীণ অর্থনৈতিক তাগিদে নারীদের আরও সক্রিয় হতে হবে এবং তাদের প্রতি সমাজ ও সরকারের পক্ষ থেকেও প্রয়োজনীয় আরও সহায়তা দান করতে হবে। তাদের প্রেরণায় সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর নারীরা আরও তৎপর হয়ে উঠবেন এটাই প্রত্যাশা।

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, খাদ্য মন্ত্রণালয়

ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

টেইসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং নৈতিক শিক্ষার প্রসারে ঝিনাইদহে মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ মে) দিনব্যাপী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ কর্মশালার আয়োজন করে হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায় প্রকল্প।

সকালে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আওয়াল। সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মুন্না বিশ্বাস, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এ বি এম খালিদ হোসেন সিদ্দিকী, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনন্দ কিশোর সাহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন হিন্দুধর্মীয় কল্যাণ

ট্রাস্টের মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম ৬ষ্ট পর্যায়ের ঝিনাইদহের প্রকল্প সহকারী পরিচালক মৌসুমি সুলতানা।

সেসময় বক্তারা বলেন, মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পটি শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

তারা আরও বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এমন প্রকল্পসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও প্রান্তিক অঞ্চলে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন উপজেলার প্রকল্প শিক্ষক, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অংশ নেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রকল্পের বর্তমান কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।